সহিংসতার মনস্তত্ব

সহিংসতা মানব ইতিহাসের আদিকাল থেকেই চলে আসছে। জীবন-ব্যবস্থার বদলের সাথে সাথে এর ধরণে এসেছে পরিবর্তন। কাউকে হত্যা করা, শারীরিক নির্যাতন করা, ভয় দেখানো বা অন্য কোন ধরণের মানসিক নির্যাতন করা, আত্মহত্যা করা বা আত্মহত্যার চেষ্টা করা, নিজেকে শারীরিক ভাবে আহত করা এবং শিশুকে নির্যাতন করা বা তার মৌলিক চাহিদা গুলো পূরণে অবহেলা করা, বৃদ্ধদের নির্যাতন করা বা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অবহেলা করা এসবই সহিংসতার নমুনা। রাজনৈতিক সহিংসতা, ধর্মীয় সংঘাত, বর্ণবাদ, জাতিগত নিপীড়ন, যুদ্ধ, সন্ত্রাসী হামলা, আত্মঘাতি বোমা হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষন, সরকারী বাহিনী কর্তৃক আইনবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও নির্যাতন সবই সহিংসতার উদাহরণ। পৃথিবীব্যাপী বছরে এক দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানুষ সহিংসতায় মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী আত্মহত্যা করেন, শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ নরহত্যার শিকার হন, শতকরা বার ভাগ যুদ্ধ বা এধরণের সংঘাতে মারা যান। বাংলাদেশেও সহিংসতার নমুনা জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়। তবে এবিষয়ে সঠিক গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যানের অভাব আছে।

সহিংসতার পরিণতি কি হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি কি ধরণের সহিংসতার শিকার হন এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সহিংসতা পরবর্তী অভিজ্ঞতার উপর। সহিংসতার পরিণতিতে মৃত্যু, আহত হওয়া, পঙ্গু হওয়া ইত্যাদির পাশাপাশি সারাজীবনব্যাপী দারুণ ক্ষতিকর মানসিক প্রভাব পড়তে পারে। এর ফলে উৎকণ্ঠা, বিষন্নতা, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅরডার, মাদকাসক্তি, অ্যালকোহলে আসক্তি, ধূমপানে আসক্তি, নিম্ন আত্মধারণা সহ নানা ধরণের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। এধরণের ঘটনার শিকার ব্যক্তি অনিাপদ যৌন মিলনে অভ্যস্ত হতে পারে, যৌন বিষয়ে দারুণ ভাবে ভীতিগ্রস্থ হতে পারে বা তার রাগ বেড়ে যেতে পারে। নির্যাতিত ব্যক্তি নিজেই একজন সহিংস ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারেন। এধরণের ঘটনার শিকার ব্যক্তির স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন, তারা হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ও এইচআইভি/এইডসের ঝুঁকিতে বেশী থাকেন।

নানা কারণে সহিংসতা ঘটে। প্রজাতিগত ভাবে মানুষের মধ্যে সহিংসতার প্রবণতা আছে। টিকে থাকার জন্য, সম্পদ ও খাদ্যের জন্য, প্রভাব বিস্তারের জন্য, যৌন সঙ্গির/সঙ্গিনীর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য, নিজের ঔরসজাত সন্তানের টিকে থাকাটা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও সহিংসতা করে। মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্তি, কিছু নিউরোলজিক্যাল রোগ, সাইকোসিস (সিজোফ্রেনিয়া ও ম্যনিয়া ইত্যাদি), ব্যক্তিত্বের রোগ, মাদকাসক্তি ও অ্যালকোহলে আসক্তির কারণেও সহিংসতা ঘটে। অতীতে ধ্বসংপ্রবণতার ইতিহাস থাকলে, রাগী মানুষ ও সহিংসতার শিকার মানুষদের মধ্যে, ক্রমাগত সহিংসতা দেখেছে এমন মানুষদের মধ্যে, যাদের আত্মীয়-বন্ধুরা সহিংসতা সমর্থন করে তাদের মধ্যে, সহিংসতা সহায়ক চিন্তা যাদের মধ্যে আছে (যারা বিশ্বাস করে যে সহিংসতা সুবিধা পাবার ভাল উপায় বা আগ্রাসী আচরণ পৌরুষের লক্ষণ, আক্রমণই সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা, মহিলাদের না মারলে তারা নিয়ন্ত্রণে থাকেনা) তাদের মধে সহিংসতা ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বৈবাহিক দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা, সামাজিক দক্ষতার অভাব এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার অভাব থাকলে, সহিংসতার শিকার হলে বা সহিংসতা দেখলে ব্যক্তির মধ্যে সহিংসতার প্রবণতা তৈরী হতে পারে। সমমর্যাদার মানুষের মধ্যে ঈর্ষার কারণে এবং নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও সহিংসতা ঘটতে পারে।

ঘনিভূত দারিদ্র্য, ঘনবসতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক মতপার্থক্য, সামাজিক সংগঠনের অভাব (যেমন, মাতবর বা সলিশদার বা মুরুব্বীদের শাসন নেই), দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগের অভাব থাকলে, সুশাসনের অভাব থকালে, অফলপ্রসু বিচারব্যবস্থা ও অফলপ্রসু আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী থাকলে, মাদকব্যবসায়ী চক্র শক্তিশালী হলে, সমাজে অপরাধের গ্রহণযোগ্যতা থাকলে, জাতিগত, ধর্মীয় ও বর্ণবাদী নিপীড়ন থাকলে, অস্ত্র সহজলভ্য হলে, রাষ্ট্র নিজেই হত্যাও নির্যাতনের পথ বেছে নিলে সমাজে সন্ত্রাসের প্রসার ঘটতে পারে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে বহুমূখী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী উদ্যোগে সর্বনিম্ন দারিদ্র্যপীড়িতদের জন্য সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উদ্যোগ, সবধরণের জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের অবসান, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কার্যকর বিচার ব্যবস্থা ও দক্ষ আইনশৃঙ্খলারক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা, অপরাধীদেনর পূনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া, সহিংস মানুষদের সনাক্ত করা ও চিকিৎসা দেয়া, তাদের হাত হতে অন্যদের নিরাপদ করা, আইনও বিচার ব্যবস্থার সাথে কমিউনিটি বা সমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা, অস্ত্র দূর্লভ করা ও নিয়ন্ত্রণ করা, বিধ্বংসী অস্ত্র সীমিত করা বা ধ্বংস করে দেয়া (যেমন, রাসায়নিক ও পারমাণবিক অস্ত্র) ও শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধ করা যায়। সংলাপের ও সমঝোতার মাধ্যমে রাজনৈতিক হানাহানি কমানো বিশেষ ভাবে দরকার।

নির্যাতিতদের দ্রুত সনাক্ত করা ও পর্যাপ্ত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা দেয়া ও আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্যাতনকারী যাতে নির্যাতিতর কাছে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধ করা যায়।

ফ্যামিলি কাউন্সেলিং, প্রিম্যারিটাল কাউন্সেলিং, ম্যারিটাল কাউন্সেলিং, ট্রমা ফোকাস্ড্ কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ, অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, সমস্যা সমাধান প্রশিক্ষণ, সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন প্রশিক্ষণ, শিশু প্রতিপালনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহিংসতা কমানো যায়।

সহিংসতা একটি মাত্র কারণে হয়না। এর সমাধানও বহুমাত্রিক। এজন্য সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক ভাবে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। বর্তমান লেখাটির বিষয়ে মতামত জানাতে লেখককে মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com -এই ইমেইলে।